টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিথরা এক বিকল্প ইতিহাস

অপাবৃতা চক্রবর্তী

মহাশ্বেতা দেবীর 'টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা' উপন্যাসটি লেখা হয়েছে মধ্যপ্রদেশের এক আদিবাসি অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে। ভারতবর্ষের আদিম জনজাতি এই অঞ্চলের মানুষেরা। এরা নাগেসিয়া নামে পরিচিত। ছোটোনাগপুর, সিংভূম অঞ্চলের কোল, ভীল, মুন্ডা, হো প্রভৃতি আদিবাসীরা এদের মতোই প্রাচীন ভারতের। মহাশ্বেতা দেবী এখানে দেখাতে চেয়েছেন ভারতবর্ষের আদিম এই জনজাতি ঔপনিবেশিক সময় থেকে উত্তর-ঔপনিবেশিক সময় পর্যন্ত সব সময়ই মূলস্রোতে ব্রাত্য থেকে গেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে জঙ্গালের মধ্যে বসবাস করতো এই আদিম জনজাতি। ১৭৫০-১৮০০ সময় পর্বে কিছু বহিরাগত মানুষ এইসব অঞ্চলের দখল নিতে আসে। এর ফলে আদিবাসীদের গ্রাম-সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। নিজেদের জমিতে নিজেরাই হয়ে পড়ে বহিরাগত। এরপর তাদের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। তাদের ওপর শুরু হয় অত্যাচার। নির্মমভাবে দমন করা হয় তাদের। আদিবাসী সমাজ বিদ্রোহ শুরু করে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে। ১৮৯৯ সালে শুরু হয় 'উলগুলান' —বীরসার নেতৃত্বে। এরপর থেকে ছোটো-বড়ো নানা ধরনের আন্দোলন সংঘটিত হলেও আদিবাসীরা তাদের অধিকার ফিরে পায় না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই জনজাতির অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না, তারা সমাজের মূল স্রোতে ব্রাত্যই থেকে যায়। মধ্যপ্রদেশের এই আদিবাসী গ্রামের মানুষ এখনও লড়াই করে বেঁচে থাকে খাদ্যের জন্য। শিক্ষা, চিকিৎসা এখনও তাদের কাছে পৌঁছতে পারেনি। এই মানুষগুলোর যন্ত্রণা-দুঃখকে ১৯৮৭ সালে লিপিবদ্ধ করেন মহাশ্বেতা তাঁর এই 'টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা' উপন্যাসে।

উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে দেখা যায় সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত উপনিবেশিত মানুষরা মিথ দিয়ে নিজেদের প্রাক-উপনিবেশ সংস্কৃতি -ঐতিহ্যকে পুনর্গঠন করতে চেয়েছে। ইতিহাসের ঔপনিবেশিক স্বরের পাশাপাশি তারা তুলে ধরেছে কিংবদন্তী, অতিকথা, লোককথার মধ্যে মিশে থাকা স্বরকে। পুনর্নির্মাণ ঘটে ইতিহাসের। মহাশ্বেতা দেবীর আখ্যানের কেন্দ্রে সর্বদাই থাকে কোনো-না-কোনো মিথ, যাকে তিনি ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতায় পুনর্নির্মাণ করেন। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ''যেহেতু প্রত্যক্ষ ইতিহাসের পরাজয়কে তিনি শেষ কথা বলে ভাবেন না, সেহেতু এক পুরাণের জাগরণ ঘটে তার গল্প উপন্যাসের বৃত্তে। এ যেন সেই মিথের জগৎ। মিথের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অমরতা। তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাসচেতনার সঙ্গে এই মিথকে উপাদানকে মেশান বলেই মহাশ্বেতা দেবীর কুশীলবরা ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ইতিহাসের বাইরে দাঁড়াতে পারে। এই মিথ অবিকল রূপে তাঁর গল্প উপন্যাসে থাকে না। এক আধুনিক চৈতন্যের প্রক্রিয়ায় তা ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে ওঠে। ফলে চরিত্রগুলি একই সঙ্গে মিথিক ও ঐতিহাসিক। ইতিহাস ও মিথের সংমিশ্রণের ফলে এদের পরাজয়, ব্যর্থতা ছাপিয়ে এক বিরাটত্ব, বারবার জন্মাবার, উজ্জীবনের নতুন পূরাণ আসে। ফলে সঙ্গত ভাবেই মহাশ্বেতার উপন্যাসের চরিত্রগুলি পৌরাণিক হয়ে ওঠে। মিথিক বাস্তবেই সে মুক্তি পেতে চায়। ইউরোকেন্দ্রিক আধুনিক সময় চেতনা এই পুরাণ আসে। ফলে সঙ্গত ভাবেই মহাশ্বেতার এই উপন্যাসে মিথ শুধুমাত্র বিষয়গত নয়, আখ্যান কৌশল হিসেবে ক্রিয়া করে। 'টেরোড্যাকটিল'—এই মিথ নিশে যাচ্ছে আদিম এই জনজাতির সাথে। বলা যেতে পারে, প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্যায়ের দিকে অর্থাৎ ঔপনিবেশিক সময়ে হারিয়ে যাওয়া শিকড়ের দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য মিথকে এখানে ব্যবহর করা হয়েছে। লিখিত আখ্যানে মহাশ্বেতা প্রায়ই লৌকিক, কথ্য আখ্যানধর্মীতার প্রবেশ ঘটান। কথকতার কথক যেমন গল্প বলার সময় মাঝে মাঝেই গল্প বলা থামিয়ে মন্তব্য জড়ে দেয়, সাম্প্রতিক কোনো সমল্যার ইঙ্গিত দিয়ে পুরোনো গল্পটিকে নতুন তাৎপার্যে ধরার চেষ্টা করে। এখানেও ঠিক তাই ঘটে। ভাষাহীন সুদূরবর্তী আদিবাসী জগতকে ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি 'স্পিকারলি টেক্সট' রচনা করেন। এই শব্দ প্রথম ব্যবহার করেছিলেন হেনরি লুইস গেটস, জুনিয়ার। জোলা নিয়েল হার্সটন প্রসঙ্গে হেনরি লুই বলেছিলেন—'a text whose rhetorical strategy is designed to represent an oral literary tradition to emulate the phonetic, grammatical and lexical patterns of actul speech and produce the illusion of oral narration." মহাশ্বেতা এমনভাবে বাচনিক পাঠকৃতি ব্যবহার করেন যেখানে মৌখিক ঐতিহ্যের প্রভাব এবং লিখিত ঐতিহ্যের উপাদানগুলিকে এড়ানো যায় না।

'টেরোড্যাকটিকল, পূরণ সহায় ও পিরথা' উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট মধ্যপ্রদেশের নাগেসিয়া নামের এক আদিবাসী জনজাতির গ্রাম। এই আদিবাসীরা প্রাচীন ভারতবর্ষের মূল জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। মহাশ্বেতা দেবী এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের দুঃখ-যন্ত্রণা ও বঞ্চনার ইতিহাসকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। উপনিবেশকারীদের কাছে এই আদিম জনজাতি 'অপর' বা 'প্রান্ত'। স্বাধীনতার পরেও এদের এই পরিচয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না। এরা নিম্নবর্গীয় সমাজে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আন্তোনিও গ্রামশ্চি ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক আধিপত্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে 'সাবঅলটার্ন' শব্দটির প্রথম প্রয়োগ করেন। এর বাংলা প্রতিশব্দ 'নিম্নবর্গ'। গ্রামশ্চির তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজের উচ্চবর্গ শ্রেণি ক্ষমতার অধিকারী। শুধুমাত্র শাসন ও অর্থনৈতিক

ক্ষেত্রে নয় সার্বিকভাবে অর্থাৎ সাংস্কৃতিক ও ভাবাদর্শের ক্ষেত্রেও এরা আধিপত্য (হেজেমনি) বিস্তার করে। রণজিৎ গুহ গ্রামশ্চির এই তত্ত্বের সাহায্যে পূর্বসূরী ভারতীয় ইতিহাস চর্চার সমালোচনা করেন। তাঁর মতে ভারতের ইতিহাসে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের বিভাজন বহুদিন থেকেই সুস্পষ্ট। উচ্চবর্গীয়রা দীর্ঘদিন ধরে নিম্নবর্গদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। ফলে ক্ষমতার অধিকারী উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গীয়রা থেকেছে নিষ্ক্রিয়, ভীরু, একান্ত অনুগত হিসেবে। মহাশ্বেতার এই উপন্যাসেও 'নাগেসিয়া' জাতির আদিম মানুষেরা ক্ষমতাব্যবস্থার আধিপত্যকে স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের নিজস্ব কোনো মতামত এখানে উঠে আসেনি। কিন্তু এই ধারণা, তাদের এই চিন্তনকে অন্যভাবে দেখেছেন মহাশ্বেতা। এই উপন্যাস তিনি লিখেছেন এইসব মানুষগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে। এখানে এই আদিম জনজাতির ইতিহাস আসলে 'তল থকে দেখা ইতিহাস'। উচ্চবর্গের সৃষ্ট সাহিত্যে এইসব আদিম আদিবাসীদের 'অপর' হিসেবে দেখানো হলেও নিম্নবর্গীয়দের ইতিহাসে বা আখ্যানে এরাই হয়ে ওঠে 'আত্মা'। উচ্চবর্গ হয়ে যায় 'অপর'। মধ্যপ্রদেশের পিরথা অঞ্চলের এই নাগেসিয়া প্রজাতির মানুষের যন্ত্রণা-শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস লিখতে গিয়ে মহাশ্বেতা তাই খুঁজতে চেয়েছেন এঁদের 'আত্ম'কে। এঁদের লৌকিক, মৌখিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে। ঔপনিবেশিকতার ফলে এই ঐতিহ্য হারিয়ে গেছে। তিনি ফিরে যেতে চেয়েছেন এঁদের শিকড়ের দিকে। আর এর ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ব্যবহার করেছেন মিথকে। সমাজের উপরিতলের হাজার ভাঙা-গড়ার নীচ দিয়ে বয়ে যায় যে আবহমান জনজীবন, তারই ভাষ্যকার এই মিথ। এই উপন্যাসে আদিবাসী জনজাতির বিপন্নতার কথা বোঝাতে 'টেরোড্যাকটিল' -এর মিথিকাল প্রবেশ ও প্রস্থান। টেরোড্যাকটিল এখানে আদিম যুগের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত। মেসোজোয়িক যুগের টেরোসৌরিয়া শ্রেণির উড়ন্ত সরীসৃপ টেরোড্যাকটিল। জুরাসিক যুগের টেরোড্যাকটিলাস আকারে ছিল চড়াই পাখির মতো। খুব ছোটো লেজ, মুখের সামনের দিকে ছিল দাঁত। কিন্তু বিখিয়ার খোদাই করা ছবিতে তার বাদুড়ের মতো জোড়া ডানা, অতিকায় গোসাপের মতো শরীর, নখওয়ালা চারটি পা, হাঁ-করা বীভৎস মুখ, দাঁত নেই। প্রায় ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ বছর আগের এই প্রাণি আজ বিলুপ্ত। এই প্রাণি যেমন ভারতবর্ষের আদিম জনজাতির বিলুপ্তির বার্তাবাহক। মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন, ''মেসোজোয়িক যুগের টেরোড্যাকটিলকে মরতেই হতো, কেননা কেনোজোয়িক পৃথিবী তার অজ্ঞাত। বিলুপ্ত পৃথিবী ও বর্তমান পৃথিবীর সংবাহন সম্ভব নয়।" প্রাক-ঔপনিবেশিক সময়ের আদিবাসী এই জনজাতিও যেন আজকের এই পৃথিবীতে বেমানান। তারা বহন করে নিয়ে যেতে পারছে না নিজেদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাসকে। তাই তারাও যেন আজ নিশ্চিহ্ন হবার পথে। অর্থাৎ এই উপন্যাসে টেরোড্যাকটিল ও আদিবাসী সমাজ অভিন্ন হয়ে উঠেছে। এরা মৌখিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যদিকে সাংবাদিক পূরণ লিখিত ঐতিহ্যের মানুষ। পূরণের জীবনের সাথে সমান্তরাল হয়ে উঠেছে আদিম আধিবাসী ও টেরোড্যাকটিলের জীবন। পূরণ এই দুই সময়ের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজতে চায়। উপন্যাসে দেখতে পাই সে নিজেও নাগেসিয়া অধিবাসীদের কাছে লোককথা বা মিথের অংশ হয়ে ওঠে। এভাবেই এখানে মিথ ইতিহাসের মধ্যে ঢুকে যায়।

আলোচ্য উপন্যাসের অংশে আছে সাংবাদিক পূরণের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত। পূরণের বাবা কমিউনিস্ট পার্টি করতেন। পুরণও যেন সেই আদর্শকে বহন করে চলে। ভারতবর্ষের আদিবাসী জীবনকে ও খবরের কাগজের শিরোনামে নিয়ে আসতে চায়। সবার কাছে তুলে ধরতে চায় আদিবাসী মানুষগুলোর শোষিত-নিপীড়িত-লাঞ্ছিত চেহারাকে। মহাশ্বেতা দেবী এই উপন্যাসের ভূমিকায় লিখেছিলেন, ''পূরণ সহায় এক সাংবাদিক। ওর মাধ্যমে আমি উত্তর-এমার্জেন্সি সেই পর্বকে স্মরণ করেছি, যখন তদন্তমূলক এবং কায়েমি ব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচক সাংবাদিকতার এক জোয়ার এসেছিল।" পূরণ এইসব লাঞ্ছিত মানুষগুলোকে শুধুমাত্র তার রিপোর্টের বিষয় করে রাখে না, তাদের দুঃখ - দুর্দশার অংশীদার হয়ে ওঠে। বন্ধু হরিশরণের ডাকে সে পিরথায় আসে। এই অঞ্চলের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। পূরণের যাত্রাপথ ও অনুভূতির মধ্য দিয়ে মহাশ্বেতা দেখাতে চান আদিবাসী মানুষগুলোর প্রকৃত অবস্থা। আর এই মানুষগুলোর পাশাপাশি উঠে আসে সুবিধাভোগী এক শ্রেণির মানুষের মুনাফা লোটার চেষ্টা ও কিছু সৎ সরকারি অফিসারের অসহায়তা। ক্ষমতা-ব্যবস্থা এই সব মানুষকে প্রান্তিক করে রাখে। তাই এদের দুর্দশা অনুভব করেও হরিশরণের মতো অফিসারেরা এদের জন্য কিছুই করে উঠতে পারে না। প্রত্যেক ক্ষেত্রে এদের অর্থাৎ এই আদিবাসীদের মুখোমুখি হতে হয় বঞ্চনার, শোষণের। সরকারি ভাষায় 'নো স্টোরি' হয়েই এদের দিন কেটে যায়। আর পূরণ চায় এই 'নো স্টোরি' - কে সত্যিকারে স্টোরি করে তুলতে।

মধ্যপ্রদেশের এক আদিবাসী গ্রাম পিরথা। ''জরিপে পিরথা ব্লকের ম্যাপটি গণ্ডোয়ানা ভূমির কোনো বিলুপ্ত জন্তুর মতো। জন্তুটি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মেসোজোয়িক যুগের শেষে ভারতবর্ষ যখন মূল গণ্ডোয়ানা ল্যান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে আসে,... সে সময় কোনো প্রাগৈতিহাসিক প্রাণি মুখ থুবড়ে পড়েছিল। পিরথা ব্লকের জরিপ রেখা তেমনই।" এই পিরথা ব্লকের আদিবাসী জনসমাজ এই কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে। আদিবাসীদের সমাজ ব্যবস্থা, মূল্যবোধ, সংস্কৃতিচেতনা, সভ্যতাকে সঠিকভাবে না জেনেই তকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে ক্ষমতা-ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান। এখানকার ব্লক অফিসার হরিশরণ পূরণকে যে রিপোর্ট পাঠায় তাতে লেখা ছিল এই আদিবাসীদের অনাহার, দারিদ্র, দুর্ভিক্ষের কথা। তাদের প্রতি সরকারের বঞ্চনার দৃষ্টিভঙ্গীর

কথা। এই পিরথা গ্রামে এসে পড়ে টেরোড্যাকটিল। বালক বিখিয়া তাকে দেখে, খোতাই করে ছবি আঁকে, গুহার আড়ালে ডানা ভাঙা প্রাণিটিকে লুকিয়েও রাখে। এই অলৌকিক উড়ন্ত প্রাণিটির মধ্যে সে দেখতে পায় তার পূর্বপুরুষের আত্মাকে। বিখিয়া এই প্রাচীন প্রাণিটির সাথে নিজেকে মেলাতে পারে। কিন্তু পূরণ পারে না। কারণ 'বিলুপ্ত পৃথিবী ও বর্তমান পৃথিবীর মধ্যে কোনো সংবাহন বিন্দু নেই'। বিখিয়া এই বিলুপ্ত পৃথিবী অর্থাৎ এই প্রাচীন সময়ের সাথে নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে।

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের সাথে এক কথোপকথনে মহাশ্বেতা দেবী এই উপন্যাস প্রসঙ্গে বলেন— ''টেরোড্যাকটিল আমার সমগ্র আদিবাসী অভিজ্ঞতার অংশ। ...টেরোড্যাকটিল আদিবাসীদের পৃথিবীর সকল অন্ত্যেবাসী মানুষদের যন্ত্রণার কথা বলবে। এই উপন্যাস দেখাতে চায় ভারতের সমস্ত আদিবাসী জগতের প্রতি কি করা হয়েছে।'' আসলে এই উপনাস প্রতিস্পর্ধা জানাতে চায় ক্ষমতা - ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, সন্তান বেচে দেওয়া প্রভৃতি চিহ্নকের (Signifier) মধ্যে দিয়ে মহাশ্বেতা দেখাতে চান এই মানুষগুলোর বিপন্নতাকে। আদিবাসীরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। টেরোড্যাকটিলকে পূর্বপুরুষের আত্মা বলে মনে করে তারা অশৌচ পালন করে। তাদের এই দুর্দশার কারণ হিসেবে নিজেদের কৃত কোনো কাজকেই দোষী সাব্যস্ত করে। ওরা ভাবে, ''কেন এল ভিনদেশী মানুষ? আমরা রাজা ছিলাম, প্রজা হলাম। প্রজা ছিলাম, দাস হলাম। অঋণী ছিলাম, দেনাদার করে দিল। দাস করে বেঁধে রেখে দিল। নাম হল হরোয়াহা, মাহিদার, নাম দিল খলি, নাম দিল কামিয়া, দেশ চলে গেল ঝড়ের মুখে ধুলোর মতো, চলে গেল জমি ঘর সব।'' অর্থাৎ এই মানুষগুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলে তাদের জাতিগত পরিচয়, সংস্কৃতি, ইতিহাস। তারা ফিরে পেতে চায় সম্মান, জমি, মূলস্রোতের ভারতবাসীর মতো অধিকার, হাসি-কামিয়া-মাহিদার প্রভৃতি নামের দাসত্ব থেকে মুক্তি। ওরা পায় না শিক্ষা, চিকিৎসা, বেঁচে থাকার জন্য সুস্থ পরিকাঠামো। একের পর এক মৃত্যু তাদের গ্রাস করে। তারা বিক্রি করে দেয় মহিলা ও সন্তানদের। এই বিপন্নতা ভাবিয়ে তোলে পুরণকে। সে একটি রিপোর্ট তৈরি করে। সেই রিপোর্টে উঠে আসে রাষ্ট্রের আধিপত্যের বিপরীতে ভারতবর্ষের প্রান্তিক নিম্নবর্গীয় মানুষের স্বর। এই রিপোর্ট তাই হয়ে ওঠে ক্ষমতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বয়ানের বিকল্প এক বয়ান।

এই উপন্যাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল বহুস্বর বা polyphony। এই উপন্যাস হয়ে ওঠে বহুস্বরসঙ্গতিপূর্ণ এক কাহিনি যেখানে বহু কণ্ঠস্বরের সমাহার ঘটে। বাখতিন নির্দেশিত বহুস্বরসঙ্গতিপূণ আখ্যানের মূল বৈশিষ্ট্য হল সাংলাপিক দৃষ্টিকোণ। সংলাপ বলতে তিনি বলেছেন বিভিন্ন আদর্শ, আচরণ, চিন্তার বিনিময়ে বা - প্রতিবাদ, দ্বন্দ্ব-বিরোধের সৃষ্টি ও বিকাশের বিপুল সম্ভাবনাময় গতিশীল ও জটিল আত্মসম্পর্ক। একে শুধুমাত্র কথোপকথন, উক্তি-প্রত্যুক্তি বলা যায় না। এখানে উঠে আসে বহু কণ্ঠস্বর। লেখক তাদের স্বশাসিত হবার সুযোগ দেন। স্বরগুলিও স্বাধীনভাবে তাদের নিজস্ব কথা বলতে পারে। অর্থাৎ এটি হল জীবনের বিভিন্ন অবস্থান থেকে উঠে আসা বিভিন্ন স্বর বা মতাদর্শের এক সমন্বয়। যদিও শেষ পর্যন্ত এই পরস্পরবিরোধী বহুস্বর মিলেমিশে একটি স্বরসঙ্গতি সৃষ্টি হয়, যা স্বরগুলিকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই উপন্যাসে যেমন দেখতে পাই পূরণ, হরিশরণ, এস. ডি. ও. অফিসার, কৌশলজী, বিখিয়া, শংকর প্রক্যেকের পৃথক স্বর উঠে এসেছে। এরা প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে নিজেদের কথা বলেছে। প্রত্যেকের মত বিভিন্ন। কৌশলজী চায় এই সব মানুষগুলোর কাছ থেকে আনুগত্য আদায় করে তাদের জমি, বাসভূমি কেড়ে নিয়ে পার্ক বানাতে। আবার শংকর ও তার জনজাতির মানুষরা চায় তাদের নিজেদের ভূমিতেই সরকারি সাহায্য নিয়ে বেঁচে থাকতে। আর পূরণ চায় এই আদিম মানুষগুলোর সাথে বর্তমান ভারতবর্ষের এক যোগসূত্র তৈরি করতে। রাষ্ট্র ওদের ব্রাত্য করে রাখে। আর কিছু সহানুভূতিশীল মানুষ চায় ওদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু তারা বোঝে না যে এর ফলে এই সব আদিম আদিবাসীরা তাদের লোকজ ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। পারস্পরিক এই চাওয়া-পাওয়া, দাবি, অধিকার অর্থাৎ সাংলাপিক সম্বন্ধ নিয়ে উপন্যাসের কাঠামো গড়ে ওঠে। এর সাথেই উঠে আসে কেন্দ্র ও প্রান্তের সম্বন্ধ। এখানে কেন্দ্র হল ভারতবর্ষ রাষ্ট্র আর প্রান্ত হল এই আদিম অন্ত্যেবাসী মানুষগুলো। প্রান্তের এই জনজাতি অনাহারে দিন কাটায়, বৃষ্টির অভাবে বা পর্যাপ্ত জলের অভাবে চাষ করতে পারে না, বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, দারিদ্র্যের জন্য বিক্রি করে দেয় সন্তানকে। এসব দেখেও ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্র একে দুর্ভিক্ষপ্রবণ এলাকা বলে গ্রাহ্য করে না। কারণ তাতে প্রমাণ হয়ে যাবে এদের উন্নয়নের জন্য যে টাকা পাঠানো হয়, তা এদের কাছে এসে পৌঁছয় না। আসলে পিরথা ব্লকের কোনো অস্তিত্বই রাষ্ট্র স্বীকার করে না। আর এই অবস্থার সুযোগ নেয় কৌশলজীর মতো কিছু সুবিধাভোগী মানুষ। আসলে পিরথা এখানে শুধুমাত্র মধ্যপ্রদেশের একটা ছোট ব্লক নয়, পিরথা হয়ে ওঠে এক কাল্পনিক ভূগোল, সমগ্র ভারতবর্ষ। নাগেসিয়ার মতো আদিম অধিবাসীরাই এই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম মানুষ। কিন্তু এরা আজ বিচ্ছিন্ন। মহাশ্বেতা আসলে এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে বিধ্বস্ত এই মানুষগুলো স্বাধীনতার পরেও অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। নির্যাতিত, শোষিতই থেকে যায়। অর্থাৎ ক্ষমতার শুধু হস্তান্তর হয়, পরিবর্তন হয় না। উত্তর - ঔপনিবেশিক সময়ে দাঁড়িয়ে মহাশ্বেতা মিথের মধ্যে দিয়ে আদিম জনজাতির সাথে এই সময়ের মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন। কিন্তু

উপন্যাসের শেষে দেখি টেরোড্যাকটিলের সাথে এই সময়ের মানুষ পূরণের যেমন কোনো সংবাহন বিন্দু গড়ে ওঠে না, তেমনি এই আদিম জনজাতির সাথেও কোনো যোগাযোগ বিন্দু তৈরি হয় না। তাই পূরণ অনুভব করে কোথাও বিখিয়ার কাজে, নয়তো পিরথার কাছে ভারতবর্ষের মূলস্রোতের মানুষের পরাজয় ঘটেছে। বিখিয়া, শংকর এরা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ধারক। সেই সভ্যতার ভিত্তিভূমি আজ বিপর্যস্ত সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা, বিশ্বায়নের দাপটে। এই সমস্যা শুধু ভারতের নয়, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা প্রভৃতি জায়গাতেও অনাবিষ্কৃত, ব্রাত্য থেকে যাচ্ছে প্রাচীন সভ্যতা। তাই চিনুয়া আচেবে, এনগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো, আলেহো কার্পেন্তিয়ার, গার্সিয়া মার্কেজের মতো মহাশ্বেতা দেবীর এই উপন্যাস প্রাচীন সেই সভাতোর ইতিবৃত্তকে তুলে ধরে হয়ে উঠেছে এক বিকল্প বয়ান যা প্রতিস্পর্ধা জানায় ক্ষমতা - ব্যবস্থাকে। আর রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ইতিহাসের বাইরে এই উপেক্ষিত, বঞ্চিত, শোষিতের ইতিহাস উঠে আসে আখ্যানের পাতায়। ইতিহাসের তথ্যপঞ্জী নয়, আখ্যান এখানে প্রকাশ করে ইতিহাসের 'সত্য'কে।

ইতিহাস কখনো থেমে থাকে না। পটভূমি বদলায় — সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যেতে থাকে জীবনধারা। কিন্তু সমাজের পটভূমিতে বদলায় না শোষণ ব্যবস্থার চেহারা। বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের ইতিহাস সমকালীন ঘটনামাত্র নয়, আধুনিক ইতিহাসের পর্বে পর্বে তার অভ্যুত্থান। এই ইতিহাস পাঠ্যবইয়ের পাতা থেকে উঠে আসা কোনো তথ্যপঞ্জী নয়, এই ইতিহাসে রয়েছে ভারতবর্ষের প্রাচীন দেশীয় ঐতিহ্য, বহু বছর ধরে লোকমুখে প্রচলিত লোককথা, কিংবদন্তী, ছড়া, গান, মৌখিক ঐতিহ্যের এইসব প্রচলিত উপাদান নিয়েই গড়ে উঠেছে উত্তর - ঔপনিবেশিক সময়ের আখ্যানকার মহাশ্বেতার এই উপন্যাসের শরীর। মহাশ্বেতা দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষের আদিম জনগোষ্ঠীর নিজস্ব কোনো লিপি নেই। অর্থাৎ লিখিত ঐতিহ্যের সাথে তাদের কোনা সম্পর্কই গড়ে ওঠে না। তারা বাস করে মিথের জগতে। এদের অবস্থান ক্ষমতার কেন্দ্রের বাইরে। আলোচ্য উপন্যাসে এইসব প্রান্তিক মানুষের স্বরই উঠে এসেছে। মহাশ্বেতা এই নিম্নবর্গীয় মানুষদের তুলে ধরেছেন সাহিত্যে। আর এই কাহিনি তুলে ধরার জন্য প্রয়োজনীয় সূত্র তিনি পেয়ে গেছেন এইসব অন্ত্যেবাসী মানুষদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য; জীবনচর্যা থেকে। এখানে ক্ষমতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ইতিহাসকারদের তৈরি করা ইতিহাস - তত্ত্বের প্রয়োগকে সহজেই অগ্রাহ্য করা যায়। প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত ইতিহাস নয়, সাহিত্যে উঠে আসে ভারতবর্ষের সত্যিকারের ইতিহাস, যেখানে দেখতে পাই এক বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষকে। এই ভারতবর্ষের মানুষ শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত। তাদের চোখ দিয়ে দেখতে পাই এক অচেনা ভারতবর্ষকে। বিকল্প আখ্যান কাঠামোর মধ্যে দিয়েই উঠে এসেছে ভারতবর্ষের বিকল্প ইতিহাস। প্রত্যাখ্যাত হয়েছে ঔপনিবেশিক চেতনার ধারাবাহিকতা। 'টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা' উপন্যাসটি এখানে শুধুমাত্র আদিবাসীদের বেঁচে থাকার লড়াই, আত্মসম্মান ফিরে পাওয়ার জন্য বিদ্রোহের কাহিনি নয়— এই উপন্যাস তুলে ধরে ইতিহাসের মধ্যেকার আরেক ইতিহাসকে। আর আখ্যান হয়ে উঠে তার সহায়ক।